মানসমরাল

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শারদোৎসব

(নাটিকা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক

কলিকাতা—ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্,

৭৩৷১ স্থকিয়া ষ্ট্রীট্।

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।

কান্তিক প্রেস

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

বিজ্ঞাপন

এই নাটিকাটি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়।

প্রকাশক।

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেওরা

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে!
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক পানে তুলে দে!

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ রে ফুটে
চোখের পরে আলস ভরে
রাখিসনে আর আঁচল টানি !

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদাদা

লক্ষেশ্বর

উপনন্দ

রাজা

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

শারদ শ্রী।

Kuntaline Press, Calcutta

শারদোৎসব

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস—একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি!
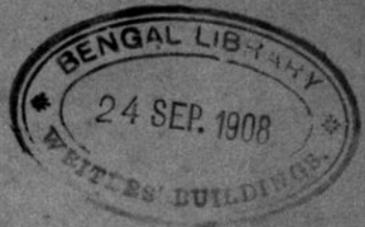
শারদোৎসব

কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি !
কেয়া পাতায় নৌকো গড়ে'
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চল্‌বে দুলে দুলে !
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি !
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি !

লক্ষেশ্বর

(ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া)

ছেলেগুলো ত জ্বালালে! ওরে চোবে! ওরে গিরধারীলাল! ধর্‌ত ছোঁড়াগুলোকে ধর্‌ত!

ছেলেরা

(দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া)

ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েচে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েচে!

লক্ষেশ্বর

হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাক্‌ড়ে আন্‌ত; একটাকেও ছাড়িস্‌নে!

একজন বালক

(চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া)

কাক লেগেচে লক্ষ্মীপেঁচা,
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা !

লক্ষেশ্বর

হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখবনা !

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা

কি হয়েছে লখা দাদা ! মার-মূর্ত্তি কেন ?

লক্ষেশ্বর

আরে দেখনা! সকাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেচে!

ঠাকুরদাদা

আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না! গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায়রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্চেন!

লক্ষেশ্বর

গান গাবার বুঝি সময় নেই! আমাব হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে! আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে!

ঠাকুরদাদা

তা ঠিক ! হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা ! ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায় ! ওরে বাঁদরগুলো, আয় ত রে ! চল্ তোদের পঞ্চানন-তলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বস গে ! আর হিসেবে ভুল হবে না !

(ছেলেরা ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া নৃত্য)

প্রথম

হাঁ ঠাকুরদাদা চল !

দ্বিতীয়

আমাদের আজ গল্প বল্‌তে হবে!

তৃতীয়

না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুর্দ্দার পাঁচালি হবে!

চতুর্থ

বটতলায় না, ঠাকুর্দ্দা আজ পারুলডাঙায় চল!

ঠাকুরদাদা

চুপ, চুপ, চুপ! অমন গোলমাল লাগাস্ যদি ত লখাদাদা আবার ছুটে আস্‌বে!

(লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েচে রে !

(কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান)

(উপনন্দের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

কিরে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি ।

উপনন্দ

কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে!

লক্ষেশ্বর

মৃত্যু! মৃত্যু হলে চল্‌বে কেন? আমার টাকাগুলোর কি হবে?

উপনন্দ

তাঁর ত কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জ্জন করে' তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র!

লক্ষেশ্বর

বীণাটি আছে মাত্র! কি শুভ সংবাদটাই দিলে!

উপনন্দ

আমি শুভ সংবাদ দিতে আসিনি! আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেচেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে' আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

বটে! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মৎলব করেচ! আমি তত বড় গর্দ্দভ নই। আচ্ছা, তুই কি করতে পারিস্ বল দেখি!

উপনন্দ

আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাইনে! আমি নিজে উপার্জ্জন করে যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

আমাদের বীণকারটিও যেমন নির্ব্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখচি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক একজনের ঐ রকম মরাই স্বভাব।— আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ

নইলে আবার কি! আমাকে ভয় দেখাচ্চ মিছে! আমার কি আছে যে তুমি আমার কিছু করবে! আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে' ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেচি। আমাকে ভয় দেখিয়োনা বল্‌চি!

লক্ষেশ্বর

না না ভয় দেখাব না! তুমি লক্ষীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে! টাকাটা ঠিক মত দিয়ো বাবা! নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে!

(উপনন্দের প্রস্থান)

ঐ যে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই ত আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মৎলবটা কি বল্‌ দেখি!

ধনপতি

ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে —আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই!

লক্ষেশ্বর

বেতসিনীর ধারে! ঐরে খবর পেয়েছে বুঝি! বেতসিনীর ধারেইত আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি! (ধনপতির প্রতি) না, না, খবরদার বলচি, সে সব না! চল্ শীঘ্র চল্ , নামতা মুখস্থ করতে হবে!

ধনপতি

(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর

দিন আবার সুন্দর কি রে! এই রকম বুদ্ধি মাথায় ঢুক্‌লেই

ছোঁড়াটা মরবে আর কি! যা বল্‌চি ঘরে যা! (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন! আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারিনে! মনে করচি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়! যাই হোক্, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে অস্‌তে হচ্চে! ছোঁড়াগুলো খবর পায়নি ত! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব! সব জিনিষ খুঁড়ে বের করে ফেলে—কোনো জিনিষের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছারখার করতেই ভালবাসে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর—বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক

ঠাকুর্দ্দা, তুমি আমাদের দলে!

দ্বিতীয় বালক

না ঠাকুর্দ্দা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে!

ঠাকুরদাদা

না ভাই আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর!

গান।

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা!

অন্য দল আসিয়া

ঠাকুর্দ্দা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আন্‌লে না কেন! তোমার সঙ্গে আড়ি! জন্মের মত আড়ি!

ঠাকুরদাদা

এত বড় দণ্ড! নিজেরা দোষ করে' আমাকে শাস্তি! আমি

তোদের ডেকে বের করব, না তোবা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আন্‌বি ! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্ !

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে !
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে !
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটচে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাট্‌বে সকল বেলা।

প্রথম বালক

ঠাকুর্দ্দা, ঐ দেখ, ঐ দেখ সন্ন্যাসী আস্‌চে!

দ্বিতীয় বালক

বেশ হয়েচে, বেশ হয়েচে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেল্‌ব! আমরা সব চেলা সাজ্‌ব!

তৃতীয় বালক

আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্‌ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না!

ঠাকুরদাদা

আরে চুপ্, চুপ্!

সকলে

সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর!

ঠাকুরদাদা

আরে থাম্ থাম্! ঠাকুর রাগ করবে!

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

বালকগণ

সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব!

সন্ন্যাসী

হা হা হা হা ! এ ত খুব ভাল কথা ! তারপরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজ্‌ব ! এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা !

ঠাকুরদাদা

প্রণাম হই ! আপনি কে !

সন্ন্যাসী

আমি ছাত্র ।

ঠাকুরদাদা

আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী

হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা

ও ঠাকুর বুঝেছি! বিশ্বের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন!

সন্ন্যাসী

চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে' খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েচে—সেইগুলো খসিয়ে ফেল্‌তে চাই!

ঠাকুরদাদা

বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধূলো দেবেন! প্রভু আপনার নাম বোধ করি শুনেছি—আপনি ত স্বামী অপূর্ব্বানন্দ!

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদাদা কি মিথ্যে বক্‌চেন! এমনি করে' আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেচ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আস্‌চে !

ছেলেরা

তোমার কতদিনের ছুটি ?

সন্ন্যাসী

খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে' বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে !

ছেলেরা

ও বাবা, তোমারো গুরুমশায় !

প্রথম বালক

সন্ন্যাসী ঠাকুর, চল আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চল। তোমার যেখানে খুসী!

ঠাকুরদাদা

আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর, আমাকেও ভুলোনা!

সন্ন্যাসী

আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েচে!

বালকগণ

উপনন্দ!

প্রথম বালক

ভাই উপনন্দ, এস ভাই! আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে! তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ

না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা

কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এস!

উপনন্দ

আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা

সে বুঝি কাজ! ভারি ত কাজ! ঠাকুর, তুমি ওকে বল না! ও আমাদের কথা শুন্‌বে না! কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী

(পাশে বসিয়া)

বাছা, তুমি কি কাজ করচ? আজ ত কাজের দিন না!

উপনন্দ

(সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া)

আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে তাই আজ কাজ করচি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই ?

উপনন্দ

ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন ; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী ; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা

হায় হায় তোমার মত কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ! ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পূজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরি মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী

বল কি, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই

ত আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেচেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মত এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেচে, চেয়ে দেখ ত! লেখ, লেখ, বাবা, তুমি লেখ, আমি দেখি! তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌চ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্চ,—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা ত পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি! এমন দিনটা সার্থক হোক্‌!

ঠাকুরদাদা

আছে আছে চষমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই না!

প্রথম বালক

ঠাকুর, আমরাও লিখ্‌ব ! সে বেশ মজা হবে !

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ সে বেশ মজা হবে !

উপনন্দ

বল কি, ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে !

সন্ন্যাসী

সেই জন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব! কি বল, বাবাসকল! আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্চে না।

সকলে

(হাততালি দিয়া)

হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের!

প্রথম বালক

দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও!

দ্বিতীয় বালক

আমাকেও একটা দাও না !

উপনন্দ

তোমরা পারবে ত ভাই ?

প্রথম বালক

খুব পাবব ! কেন পারব না !

উপনন্দ

শ্রান্ত হবে না ত ?

দ্বিতীয় বালক

কথ্‌খনো না।

উপনন্দ

খুব ধরে ধরে লিখ্‌তে হবে কিন্তু!

প্রথম বালক

তা বুঝি পারিনে! আচ্ছা তুমি দেখ!

উপনন্দ

ভুল থাক্‌লে চল্‌বে না।

দ্বিতীয় বালক

কিচ্ছু ভুল থাক্‌বে না।

প্রথম বালক

এ বেশ মজা হচ্চে! পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব!

দ্বিতীয় বালক

নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক

কি বল ঠাকুর্দ্দা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ঠাকুরদাদার গান

সিন্ধু ভৈরবী—তেওরা

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।
বোঝা যত বোঝাই করি
করবরে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের পরে ধরব পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হতে কে করে রে মানা!
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা!
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাক্‌ব বসে?
পালের রসি ধরব কসি
চলব গেয়ে গান।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা !

ঠাকুরদাদা

(জিভ কাটিয়া)

প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে ?

সন্ন্যাসী

তুমি যে জগতে ঠাকুর্দ্দা হয়েই জন্মগ্রহণ করেচ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেচেন, সে ত তুমি লুকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না ! ছোট ছোট ছেলেগুলির কাছেও ধরা পড়েচ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে ?

ঠাকুরদাদা

ছেলে ভোলানোই যে আমার কাজ—তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তাহলে কথা নেই। তা কি আজ্ঞা কর!

সন্ন্যাসী

আমি বল্‌ছিলেম ঐ যে গানটা গাইলে ওটা আজ ঠিক হল না। দুঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা ওটা আমার কানে ঠিক লাগচে না। দুঃখ ত জগৎ ছেয়েই আছে কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখ না টানাটানির ত কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর একটা গান গাইতে হল।

ঠাকুরদাদা

তোমাদের সঙ্গ এই জন্যই এত দামী—ভুল করলেও ভুলকে সার্থক করে তোল।

সন্ন্যাসী

গান

ললিত—আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।

চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার !
ধন ধান্য তোমারি ধন,
কি করবে তা কও !
দিতে চাও ত দিয়ো আমায়
নিতে চাও ত লও !
দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ,
খাঁটি রতন তুই ত চিনিস্
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস্
এ মোর অহঙ্কার ।

বাবা উপনন্দ তোমার প্রভুর কি নাম ছিল ?

উপনন্দ

সুরসেন ।

সন্ন্যাসী

সুরসেন ! বীণাচার্য্য !

উপনন্দ

হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জান্‌তে ?

সন্ন্যাসী

আমি তাঁর বীণা শুন্‌ব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ

তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল ?

ঠাকুরদাদা

তিনি কি এত বড় গুণী ? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেচ ? তবে ত আমরা তাঁকে চিনি নি ?

সন্ন্যাসী

এখানকার রাজা ?

ঠাকুরদাদা

এখানকার রাজা ত কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুন্‌লে ?

সন্ন্যাসী

তোমরা হয় ত জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা

বল কি ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয় ? তিনি যে আমাদের চক্রবর্ত্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী

তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন স্বরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, এত বড় লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী

আদর করনি—তাতে তাঁকে কমাতে পারনি, আরো তাঁকে বড়

করেচ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েচেন। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কি রকমে সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ

ছোট বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনি মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বল্লেন,

এস বাবা, আমার ঘরে এস। সেই দিন থেকে ছেলের মত তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেচেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেননি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহলে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বল্লেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্চি। এই বলে আমাকে রং দিয়ে চিত্র করে' পুঁথি লিখ্‌তে শিখিয়েচেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠ্‌ত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌তেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জান্‌ত।

সন্ন্যাসী

স্বরসেনের বীণা শুন্‌তে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখ, লেখ!

ছেলেরা

ঐরে ঐ আস্‌চে! ঐরে লখা, ঐরে লক্ষ্মীপেঁচা!

(দৌড়)

লক্ষেশ্বর

আ সর্ব্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম

ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে! তা ত নয় দেখ্‌চি! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা! আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখচি! সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে! উপনন্দ!

উপনন্দ

কি!

লক্ষেশ্বর

ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে! এখানে কি করতে এসেছিস্?

উপনন্দ

অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা না কি?

লক্ষেশ্বর

এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কিহে বাপু! ভারি সেয়ানা দেখ্‌চি! তুমি বড় ভালমানুষটি সেজে আমার

কাছে এসেছিলে! আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেচে—কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ

আমি ত সেই জন্যেই এখানে পুঁথি লিখ্‌তে এসেছি।

লক্ষেশ্বর

সেই জন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করচ বাপু! আমি কি শিশু!

সন্ন্যাসী

কেন বাবা, তুমি কি সন্দেহ করচ ?

লক্ষেশ্বর

কি সন্দেহ করচি ! তুমি তা কিছু জান না ! বড় সাধু ! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার !

ঠাকুরদাদা

আরে কি বলিস্ লখা ? আমার ঠাকুরকে অপমান !

উপনন্দ

এই বং-বাঁটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না। টাকা হয়েচে বলে অহঙ্কার! কাকে কি বলতে হয় জান না!

(সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন)

সন্ন্যাসী

আরে কর কি ঠাকুরদাদা, কর কি বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে! যেম্‌নি দেখেচে অম্‌নি ধরা পড়ে গেছে! ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না!

লক্ষেশ্বর

না, ঠিক ঠাওরাতে পাচ্চিনে! হয় ত ভাল করিনি! আবার শাপ দেবে, কি, কি করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধূলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর,—হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই- ভণ্ডটাই বুঝি! ঠাকুর্দ্দা, তুমি এক কাজ কর! সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চল্লেম বলে। তোমরা এগোও!

ঠাকুরদাদা

তোমার বড় দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেচেন!

সন্ন্যাসী

বল কি ঠাকুর্দ্দা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈ কি! বাবা লক্ষেশ্বর চল তোমার ঘরে!

লক্ষেশ্বর

আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও! উপনন্দ, তুমি আগে ওঠ! ওঠ, শীঘ্র ওঠ বলচি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র!

উপনন্দ

আচ্ছা তবে উঠ্‌লেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না!

লক্ষেশ্বর

না থাক্‌লেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কি! এত দিন ত আমার বেশ চলে যাচ্ছিল!

উপনন্দ

আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস চুকে গেল!

(প্রস্থান)

লক্ষেশ্বর

ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে না কি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভাল! এখন কি করি! (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বস—এই যে এইখানে—আর একটু বাঁ দিকে সরে এস—এই হয়েচে। খুব চেপে বস! রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না! তাহলে আমি তোমাকে খুসি করে দেব!

ঠাকুরদাদা

আরে লখা করে কি! হঠাৎ খেপে গেল না কি!

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই! আমাকে দেখ্‌লেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েচে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেচি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেচেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রজাদের জলদান করচেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিৎ কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পারিনে!

(প্রস্থান)

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত

সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম হই ! আপনিই ত অপূর্ব্বানন্দ !

সন্ন্যাসী

কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই ত জানে !

দূত

আপনাব অসামান্য ক্ষমতার কথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনাব সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী

যখনি আমাব প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌বেন তখনি আমাকে দেখ্‌তে পাবেন।

দূত

আপনি তাহলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী

আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাক্‌ব। অতএব আমার মত অকিঞ্চন অকর্ম্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহলে তাঁকে এইখানেই আস্‌তে হবে।

দূত

রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করচেন।

সন্ন্যাসী

যদি নিকটেই হয় তবে ত তাঁর আস্‌তে কোনো কষ্ট হবে না।

দূত

যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাইগে!

(প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখ, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা

রাজার উৎপাতই ঘটুক্ আর অরাজকতাই হোক্ আমি প্রভুর চরণ ছাড়চিনে।

(প্রস্থান)

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর তুমিই অপূর্ব্বানন্দ। তবে ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে! আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী

তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর

বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে ত সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কি হবে! আমাকে একটা কিছু ভাল রকম বর দিতে হচ্চে! যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধুহাতে ফিরচিনে!

সন্ন্যাসী

কি বর চাই!

লক্ষেশ্বর

লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কি না আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেচে—সে অতি যৎসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ত মিট্‌চে না। শরৎকাল এসেচে, আর ঘরে বসে থাক্‌তে পারচিনে—এখন বাণিজ্যে বেরতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়!

সন্ন্যাসী

আমিও ত সেই সন্ধানেই আছি!

লক্ষেশ্বর

বল কি ঠাকুর !

সন্ন্যাসী

আমি সত্যই বলচি !

লক্ষেশ্বর

ওঃ তবে সেই কথাটাই বল ! বাবা, তোমরা আমাদেব চেয়েও সেয়ানা !

সন্ন্যাসী

তার সন্দেহ আছে !

লক্ষেশ্বর

(কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে)

সন্ধান কিছু পেয়েচ ?

সন্ন্যাসী

কিছু পেয়েচি বই কি ! নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন ?

লক্ষেশ্বর

(সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া)

বাবাঠাকুর, আর একটু খোলসা করে বল ! তোমার পা ছুঁয়ে

বলচি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না! কি খুঁজচ বল ত, আমি কাউকে বলব না!

সন্ন্যাসী

তবে শোন! লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর

ও বাবা, সে ত কম কথা নয়! তাহলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ ত তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেচ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন

তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজ্‌তে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন ; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুণটিকে ত জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাক্‌বে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠ্‌বে ? এতে ত খরচপত্র আছে। এক কাজ কর না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী

তাহলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর

সে যে শক্ত কথা !

সন্ন্যাসী

সব ব্যবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যবসা চল্‌বে !

লক্ষেশ্বর

শেষকালে দুকূল যাবে না ত ? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তাহলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চল্‌তে রাজি আছি। সত্যি বলচি ঠাকুর, কারো কথায় বড় সহজে বিশ্বাস করিনে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগ্‌চে !

আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব! ঐরে রাজা আস্‌চে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াইগে!

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া—ঝাঁপতাল

রাজ রাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারী,
সঙ্কট শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

(রাজার প্রবেশ)

রাজা

প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

জয় হোক্ ! কি বাসনা তোমার !

রাজা

সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু !

সন্ন্যাসী

তাহলে গোড়া থেকে সুরু কর। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও!

রাজা

পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাক্‌তে পারব না।

সন্ন্যাসী

রাজন্ তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা

বল কি ঠাকুর !

সন্ন্যাসী

এক বর্ণও মিথ্যা বলচি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করচি।

রাজা

তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েচ ?

সন্ন্যাসী

তাই বটে !

রাজা

মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে ?

সন্ন্যাসী

অসম্ভব নেই।

রাজা

তাহলে ঠাকুর আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব! যদি সে বশ মানে তাহলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী

তা বেশ, সেই চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌কে আমি তোমার সভায় ধরে আন্‌ব।

রাজা

কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করচে না। শরৎকাল এসেচে—সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্ব্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী

কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এইত উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কি করবে?

রাজা

আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব—তার অহঙ্কার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী

এ ত খুব ভাল কথা! যদি তার অহঙ্কার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুসি হব।

রাজা

ঠাকুর, চল আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী

সেটি পারচিনে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিচ্ছু ভেব না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেচ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্চে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেচে তা ত আমি জান্‌তেম না।

রাজা

তবে বিদায় হই। প্রণাম।

(প্রস্থান)

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া)

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি ত বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বল দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য ?

সন্ন্যাসী

কিছুমাত্র না ! লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মত। তার সাজ সজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা

বল কি ঠাকুর, হা হা হা হা ! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ !

সন্ন্যাসী

আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোষাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা

তাই দিয়ো, ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী

তার ভণ্ডামি আমার কাছে ত কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ

মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সে দিন সব চাষী গৃহস্থরা বনে গিয়ে সীতার পূজা করে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে এক সঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে! রাজাই হোক্ আর যাই হোক্ ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়? সেবারে ত সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে খাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকরবাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বল্লে এ কথনোই হতে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেল্লেই আসল মানুষটা ধরা

পড়ে যাবে। এই জন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড় ভয়ে ভয়েই থাকে—কোন্ দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা!

রাজা

ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও! ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড় অহঙ্কার হয়েছে!

সন্ন্যাসী

আমি ত সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা

প্রণাম। (প্রস্থান)

(উপনন্দের প্রবেশ)

উপনন্দ

ঠাকুর, আমার মনের ভার ত গেল না!

সন্ন্যাসী

কি হল বাবা!

উপনন্দ

মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেচে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধূলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠ্‌ল—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বল্‌তে পারিনে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ ত আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্চে না! ইচ্ছা

করচে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি! আমি তোমাকে মিথ্যা বলচিনে তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে,—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল!

সন্ন্যাসী

বাবা, তুমি যা বলচ সত্যই বল্‌চ!

উপনন্দ

ঠাকুর, তুমি ত অনেক দেশ ঘুরেচ আমার মত অকর্ম্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন?

তাহলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তাহলে বালক বলে ছোট জাত বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী

না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবচি কি যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ

বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী

তাই না কি ?

উপনন্দ

তুমি জাননা বুঝি ?

সন্ন্যাসী

তা হবে। না হয় তাই হল !

উপনন্দ

আমার মত ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিন্‌বেন ?

সন্ন্যাসী

বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মত ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তাহলে বিনামূল্যেই কিন্‌বেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জম্‌বে যে তাঁব রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বল্‌চি।

উপনন্দ

ঠাকুর, এও কি সম্ভব ?

সন্ন্যাসী

বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড় সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই ?

উপনন্দ

আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় ত হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড় গ্লানি হচ্চে।

সন্ন্যাসী

ঠিক কথা বলেচ বাবা! বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারো প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়োনা।

উপনন্দ

তাহলে চল্লেম ঠাকুর! তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েচি সে আমি বলে উঠতে পারিনে।

সন্ন্যাসী

তোমাকে দেখে আমিও যে কত বল লাভ করেচি সে কথা কেমন করে বুঝবে? এক কাজ কর বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙ্গে গিয়েচে আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসগে!

উপনন্দ

তা আন্‌চি, কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চল্‌বে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুসি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারিনে।

(প্রস্থান)

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম—পারব না! তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই!

সন্ন্যাসী

সে কথাটা বুঝ্‌লেই হল।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্চে!

সন্ন্যাসী

(উঠিয়া)

তাহলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল!

লক্ষেশ্বর

(মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া)

ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চারদিকে ভূতের মত ঘুরে বেড়িয়েছি।

এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্য্যন্ত কেবলি এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হাল্কা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না হলনা! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিষ একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেচি আমার বুকের ভিতরে যেন গুর্‌গুর্‌ করচে! আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বল ত? তাকে বিক্রি করতে গেলে সে ত দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুস্কিল হয়েচে! আমি

এটা বেচ্‌তেও পারচিনে, রাখতেও পারচিনে, এর জন্তে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর ?

সন্ন্যাসী

সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায় ?

লক্ষেশ্বর

সেই ত মুস্কিলের কথা! আমি দেখ্‌চি এটা মাটিতেই পোঁতা থাক্‌বে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী

রাজাও না সম্রাট্‌ও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে! তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে!

লক্ষেশ্বর

তা নিক্‌গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয় ত খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক্‌ ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড় ভাল লাগ্‌ল। আমার কেমন মনে হচ্চে

ওটা তুমি হয়ত খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক্‌গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না! প্রণাম!

(প্রস্থান)

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেচি—সেটি তোমাকে খুলে না বলে থাক্‌তে পারচিনে।

ঠাকুরদাদা

আমার প্রতি ঠাকুরের বড় দয়া!

সন্ন্যাসী

আমি অনেকদিন ভেবেচি জগৎ এমন আশ্চর্য্য সুন্দর কেন ? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করচে! বড় সহজে করচে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করচে! সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্য্যে ভরে উঠেচে, বেতসিনীর নির্ম্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যেই এত সৌন্দর্য্য!

ঠাকুরদাদা

একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলি ঢেলে দিচ্চেন

আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারি শোধ চল্‌চে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য যে কি সে কথা তোমার কাছে পূর্ব্বেই শুনেচি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্চে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেচে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণ শোধে ঢিল্‌ পড়ে যাচ্চে সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থ।

ঠাকুরদাদা

সেইখানেই যে একপক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী

লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেচে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি!

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

তোমরা চুপি চুপি ছুটিতে কি পরামর্শ করচ?

সন্ন্যাসী

আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর

অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুর্দ্দার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানী করবে? তবেই হয়েচে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এসব কি ঠাকুর্দ্দার কর্ম্ম? ওঁর পুঁজিই বা কি?

সন্ন্যাসী

তুমি খবর পাওনি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়! ভিতরে ভিতরে জমিয়েচে!

লক্ষেশ্বর

(ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া)

সত্যি না কি ঠাকুর্দ্দা? বড় ত ফাঁকি দিয়ে আসচ! তোমাকে ত চিনতেম না! লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে ত স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না! তাহলে এতদিনে থানাতল্লাসী পড়ে যেত। আমি ত, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখিনে।

ঠাকুরদাদা

তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় ঊর্দ্ধস্বরে চোবে, তেওয়ারী, গির্‌ধারীলালকে হাঁক পাড়ছিলে!

লক্ষেশ্বর

যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আস্‌বে না, তখন ঊর্দ্ধস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুল্‌তে হয়! কিন্তু বলে ত ভাল করলেম না! মানুষের সঙ্গে কথা কবার ত বিপদই ঐ! সেই জন্যেই কারো কাছে ঘেঁসি নে! দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়োনা!

ঠাকুরদাদা

ভয় নেই তোমার!

লক্ষেশ্বর

ভয় না থাক্‌লেও তবু ভয় ঘোচে কই! যা হোক্ ঠাকুর, একা ঠাকুর্দ্দাকে নিয়ে অত বড় কাজটা চল্‌বে না! আমরা না হয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুর্দ্দা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্চে না! আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম! ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আস্‌চে! ঐ দেখ্‌চ না দূরে—আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েচে! সবাই খবর পেয়েচে

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ এসেচেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্য্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক্ তুমি যে রকম আলগা মানুষ দেখচি, সেই কথাটা আর কারো কাছে ফাঁস কোরোনা—অংশীদার আর বাড়িয়োনা! কিন্তু ঠাকুর্দ্দা, লাভলোক-সানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হলেই হয় না; সব কথা ভেবে দেখো!

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, আর ত দেরি করলে চল্‌বে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেচে, পুত্র দাও ধন দাও করে আমাকে একেবারে মাটি

করে দেবে! ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাক। তারা ধন চায় না পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা

ছেলেদের আর ডাক্‌তে হবেনা। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্চে! এল বলে!

(লক্ষেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

না বাবা, আমি পারব না! ভাল বুঝ্‌তে পারচিনে। ও সব

আমার কাজ নেই—আমার যা আছে সেই ভাল। কিন্তু তুমি আমাকে কি যেন মন্ত্র করেচ তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার ত রক্ষে নেই! তুমি ঠাকুর্দ্দাকে নিয়েই কারবার কর, আমি চল্লেম।

(দ্রুত প্রস্থান)

(ছেলেদের প্রবেশ)

ছেলেরা

সন্ন্যাসী ঠাকুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

কি বাবা!

ছেলেরা

তুমি আমাদের নিয়ে খেল!

সন্ন্যাসী

সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা

কি খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী

আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক

সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক

সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক

সে কি খেলা ঠাকুর ?

চতুর্থ বালক

সে কেমন করে খেল্‌তে হয় ?

সন্ন্যাসী

তবে এক কাজ কর। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এস। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আন্‌তে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলি ফুলের মালা গেঁথে ঐ খানে ফেলে রেখে গেছ সেগুলো নিয়ে এস।

প্রথম বালক

কি কর্ত্তে হবে ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী

আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে—আমি হব শারদোৎসবের পুরোহিত।

সকলে

(হাততালি দিয়া)

হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড় মজাই হবে।

(কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল)

(একদল লোকের প্রবেশ)

প্রথম ব্যক্তি

ওরে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি

ফেল ফেল তোমার জটা ফেল!

চতুর্থ ব্যক্তি

দেখ না আবার গেরুয়া পরেচে!

সন্ন্যাসী

জটাও ফেল্‌ব, গেরুয়াও ছাড়ব, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক্‌!

প্রথম ব্যক্তি

তবে যে আমাদের কে একজন বল্লে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেচে!

সন্ন্যাসী

যদি বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কেন? সে ভণ্ড না কি?

সন্ন্যাসী

তা নয় ত কি ?

তৃতীয় ব্যক্তি

বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভাল। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী

শেখবার ইচ্ছা ত আছে কিন্তু শেখায় কে ?

তৃতীয় ব্যক্তি

একটি লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা

বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কি, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বল্লে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাস্‌ছ কি, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেচে! সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে তুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল! বিদ্যে যদি শিখ্‌তে চাও ত সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি

ওরে চল্‌ রে বেলা হয়ে গেল! সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে!

সে কথা আমি ত তখনি বল্লেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে রকম যোগবল আছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

সে ত সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বল্লে তার ভাগ্‌নে নিজের চক্ষে দেখে এসেচে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কল্কেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ব্যক্তি

বল কি, নিজের চক্ষে দেখেচে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি

হাঁরে, নিজের চক্ষে বৈ কি!

তৃতীয় ব্যক্তি

আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে ; ভাগ্যে যদি থাকে তবে ত দর্শন পাব! তা চল্‌না ভাই, কোন্‌দিকে গেল একবার দেখে আসিগে!

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

(বালকদের প্রতি)

বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে!

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী

বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েচে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে ত—নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কি করে ? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিল্‌ব বলেই ত উৎসব।

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী

ঐ বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও। যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুর্দ্দা তুমি এদের সাজিয়ে আনগে!

ঠাকুরদাদা

তবে চল সবাই।

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসীর গান

রামকেলি—কাওয়ালী

নব কুন্দধবলদল-সুশীতলা
অতি সুনির্ম্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ আসনে অচঞ্চলা।
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ বিলাসিনী,
পূর্ণসিতাংশু-বিভাস বিকাশিনী
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা।

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ)

লক্ষেশ্বর

দেখ ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও ত ভাল হবে না বলচি। কি মুস্কিলেই ফেলেচ, আমার হিসেবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্‌গে ও সব বাজে কথা! একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুর্দ্দাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক্‌গে ঠাকুর্দ্দা! ঠাকুর, এ ত ভাল কথা নয়! চেলা-ধরা ব্যবসা দেখচি তোমার! কিন্তু সে হবে না, কোনো মতেই হবে না! চুপ করে

হাস্‌চ কি! আমি বল্‌চি আমাকে পারবে না—আমার শক্ত হাড়! লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না!

(প্রস্থান)

(ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী

এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক্! এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও! একবার পূর্ব্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্‌মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্‌যত্রোপদৃশ্যতে॥

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এস। ঠাকুর্দা, তুমি গানটি

ধরিয়ে দাও! তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি—একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসগো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে,

এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে।
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়া তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,

হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে !
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা ॥

সন্ন্যাসী

পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে ! দ্বার খুলেচে তাঁর ! দেখ্‌তে পাচ্চ কি, শারদা

বেরিয়েচেন! দেখ্‌তে পাচ্চনা! দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে! সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতেব সকল আরম্ভেব প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে; যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাক, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখ্‌তে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি!

গান

ভৈরবী—একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া !
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন ।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া॥

এবারে আর দেখ্‌তে পাইনি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক

কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও না।

সন্ন্যাসী

ঐ যে শাদা মেঘ ভেসে আস্‌চে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ ভেসে আস্‌চে!

তৃতীয় বালক

হাঁ আমিও দেখেচি!

সন্ন্যাসী

ঐ যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক

কিসে?

সন্ন্যাসী

কিসে! এই ত স্পষ্টই দেখা যাচ্চে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্চনা?

দ্বিতীয় বালক

হাঁ পাচ্চি।

সন্ন্যাসী

তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হয়েচে, শরীর পবিত্র হয়েচে, মন প্রশান্ত হয়েচে। এসেচেন, এসেচেন, আমাদের মাঝখানেই এসেচেন। দেখ্‌চনা বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের ক্ষেত কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেচে! গাও গাও, ঠাকুর্দ্দা, বরণের গানটা গাও!

ঠাকুরদাদার গান

আলেয়া—একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী

যাও, বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসগে।

(ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি! ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেচি! এখান থেকে আর নড়তে পারব না!

(লক্ষেশ্বরের প্রবেশ).

ঠাকুরদাদা

এ কি হল ! লখা গেরুয়া ধরেচ যে !

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো—এই আমার মণি-মাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো !

সন্ন্যাসী

তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর

সহজে হয়নি প্রভু! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আস্‌চে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাক্‌বে? তোমার গায়ে ত কেউ হাত দিতে পারবে না, এ সমস্ত তোমার কাছেই রাখ্‌লেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা কর বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা

সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

বোস, বোস, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েচ! একটু বিশ্রাম কর!

রাজা

বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েচে—তাঁর সৈন্যদল আস্‌চে!

সন্ন্যাসী

বল কি! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিঁকতে দেয়নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েচেন।

রাজা

কি সর্ব্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েচেন!

সন্ন্যাসী

বাবা, এতে দুঃখিত হলে চল্‌বে কেন? তুমিও ত রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরবার উদ্যোগে ছিলে!

রাজা

না, সে হল স্বতন্ত্র কথা! তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে —তা সে যাই হোক্, আমি তোমার শরণাগত! এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোন দুষ্টলোক তাঁর কাছে

লাগিয়েচে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেচি ; তুমি তাঁকে বলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যা ! আমি কি এম্‌নি উন্মত্ত ? আমার রাজচক্রবর্ত্তী হবার দরকার কি ? আমার শক্তিই বা এমন কি আছে ?

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা !

ঠাকুরদাদা

কি প্রভু ?

সন্ন্যাসী

দেখ, আমি কৌপীন পরে এবং গুটিকতক ছেলেকেমাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ঐ চক্রবর্ত্তী সম্রাট্‌টা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে! লোকটা কি রকম দুর্ভাগা দেখেচ!

রাজা

চুপ কর, চুপ কর ঠাকুর! কে আবার কোন্‌ দিক থেকে শুন্‌তে পাবে!

সন্ন্যাসী

ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

রাজা

আরে চুপ, চুপ! তুমি সর্ব্বনাশ করবে দেখ্‌চি! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক সে তুমি মনেই রেখে দাও!

সন্ন্যাসী

তোমার সঙ্গে পূর্ব্বেও ত সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে!

রাজা

কি মুস্কিলেই পড়লেম! সে সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্ না! ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কি শুন্‌চ! এখান থেকে যাও না!

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কি আছে! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেচে! যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সাম্‌নে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

(বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী

জয় হোক্ মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী বিজয়াদিত্য !

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

রাজা

আরে করেন কি, করেন কি ! আমাকে পরিহাস করচেন নাকি ! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী

মহারাজ, সময় ত অতীত হয়েচে এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, পূর্ব্বেই ত বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েচি কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেচেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু এ কি কাণ্ড! আমি ত স্বপ্ন দেখচিনে!

সন্ন্যাসী

স্বপ্ন তুমিই দেখ্‌চ কি এঁরাই দেখ্‌চেন তা নিশ্চয় করে কে বল্‌বে ?

ঠাকুরদাদা

তবে কি—

সন্ন্যাসী

হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই ত জানেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমিই ত তবে জিতেছি! এই কয়দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েচি তা এঁরা পর্য্যন্ত পাননি! কিন্তু বড় সঙ্কটে ফেল্লে ত ঠাকুর!

লক্ষেশ্বর

আমিও বড় সঙ্কটে পড়েছি মহারাজ! আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্চিনে!

রাজা

মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন ?

সন্ন্যাসী

না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা

(জোড়হস্তে) এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কি বিধান ?

সন্ন্যাসী

বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা

আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত !

সন্ন্যাসী

তার মধ্যে একটা ত উদ্ধার করেছি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ সেটা ত ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে .নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা কিছু কাজ করে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায়

আজই হাজির করে দেব—তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বল !

রাজা

(নতশিরে) তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী

তা বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট বলে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছু অপরাধ সে রাজকার্য্যেরই ত্রুটি। সে রকম যদি কিছু ঘটে থাকে তবে আমি কয়েকদিন তোমার রাজ্যে থেকে সে সমস্তই স্বহস্তে মার্জ্জনা করে দিয়ে যাব।

রাজা

মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েচেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেচি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘট্‌তে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কি করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই!

সন্ন্যাসী

উপদেশটি কথায় ছোট, কাজে অত্যন্ত বড়। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা

উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠ্‌ব বলে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর

আমাকেও ঠাকুর,—না, না, মহারাজ ঐ রকম একটা কি উপদেশ দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠ্‌লেম না, বোধ করি মনে রাখ্‌তেও পারব না।

সন্ন্যাসী

উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই!

লক্ষেশ্বর।

আজ্ঞা না!

(উপনন্দের প্রবেশ)

উপনন্দ

ঠাকুর! এ কি, রাজা যে! এরা সব কারা!

(পলায়নোদ্যম)

সন্ন্যাসী

এস, এস, বাবা, এস! কি বল্‌ছিলে বল! (উপনন্দ নিরুত্তর)

এঁদের সাম্‌নে বলতে লজ্জা করচ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও! তোমরাও——

উপনন্দ

সে কি কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বল্‌তে এসেছিলেম এই ক'দিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখ!

সন্ন্যাসী

আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাব্‌চ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ

আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি এ আমার তারি দক্ষিণা। কি বল বাবা!

উপনন্দ

ঠাকুর তুমি নেবে?

সন্ন্যাসী

নেব বই কি! তুমি ভাবচ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ সব জিনিষে আমার ভারি লোভ!

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ! তবেই হয়েচে! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ ক'রে বসে আছি দেখ্‌চি!

শারদোৎসব

সন্ন্যাসী

ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী

আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী

এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও!

শ্রেষ্ঠী

যে আদেশ!

উপনন্দ

তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন ?

সন্ন্যাসী

উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কি ! তুমি আমার !

উপনন্দ

(পা জড়াইয়া ধরিয়া)

আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল ?

সন্ন্যাসী

ওগো স্বভূতি !

মন্ত্রী

আজ্ঞা !

সন্ন্যাসী

আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্ম্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেচি।

লক্ষেশ্বর

হায় হায় আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে কি সুযোগটাই পেরিয়ে গেল !

মন্ত্রী

বড় আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী

ইনি যে গৃহে জন্মেচেন সে গৃহে জগতের অনেক বড় বড় বীর জন্মগ্রহণ করেচেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর

কি আদেশ!

সন্ন্যাসী

বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তাহলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী

এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন তোমার ভয় নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর

সর্ব্বনাশ করলে !

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর

এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী

আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে ?

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী

তবে তোমার ভয় নেই, যাও!

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী

এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর

তবে প্রণাম হই! চারদিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্চে! (প্রস্থান)

সন্ন্যাসী

রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা

সে কি কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন,—

সন্ন্যাসী

তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা

যাকে ইচ্ছা নাম করুন সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্চি! না হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী

বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই!

রাজা

কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার

রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী

না, অত বড় লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না আমি একেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিষ আছে কেবল বয়স্থ নেই।

ঠাকুরদাদা

বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী

ঠাকুর্দ্দা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায় তাইত দেখ্‌চি! আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েচে না কি!

ঠাকুরদাদা

কারো পালাবার পথ কি রেখেচ? আটঘাট ঘিরে ফেলেচ যে। ঐ আস্‌চে!

(বালকগণের প্রবেশ)

সকলে

সন্ন্যাসীঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

এস, বাবা, সব এস !

সকলে

এ কি ! এ যে রাজা ! আরে পালা, পালা ! (পলায়নোদ্যম)

ঠাকুরদাদা

আরে পালাস্‌নে পালাস্‌নে !

সন্ন্যাসী

তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্চেন। যাও সোমপাল সভা প্রস্তুত করগে, আমি যাচ্চি।

রাজা

যে আদেশ।

(প্রস্থান)

বালকেরা

আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি এইবার এখানে গান শেষ করি!

ঠাকুরদাদা

হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আলেয়া—একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন ভুলানো এলে !
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কি কথা কয় মনে মনে।

শারদোৎসব

তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেল ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে!
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে!

৭ই ভাদ্র ১৩১৫।